দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 8 JAN 2017
পৃষ্ঠা ... ৮ ... ২

বাংলাদেশে স্কুলের শিক্ষা বনাম কোচিং

ড. খুরশিদ আলম

বাংলাদেশে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে করণীয় বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় সম্পর্কে প্রাজ্ঞজনদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের মতামত দেখা যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরন রয়েছে, যেমন সরকারি, এমপিওভুক্ত, বেসরকারি এবং এনজিও পরিচালিত। এ-সব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকদের সন্তানেরা পড়াশুনা করতে দেখা যায়। ধনীক শ্রেণির সন্তানেরা সাধারণত নামি-দামি সরকারি বা বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়ে। গ্রামের কৃষক বা ভূমিহীন পরিবারের সন্তানেরা সরকারি স্কুলে পড়তে দেখা যায়। আর ঝরে পড়া, শিশুশ্রমে নিয়োজিতরা এনজিও স্কুলে পড়ে।

শহরের নামি-দামি সরকারি বা বেসরকারি স্কুলগুলোর সুযোগ-সুবিধার তেমন ঘাটতি নেই। কিন্তু গ্রামের কোনো কোনো সরকারি স্কুলে বসার যথেষ্ট বেঞ্চও থাকে না, যদিও সম্প্রতি সে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। আবার সরকারি স্কুলগুলোতে অনেক জায়গায় দেখা যায় যে, তিনটি ক্লাসের জন্য তিনজন শিক্ষক আছেন। ছুটি নেওয়ার কারণে বা অন্য কোনো কারণে একজন যদি না আসেন তখন একজন শিক্ষককে দুটো ক্লাস নিতে দেখা যায়। তবে সব ছাত্র প্রতিদিন আসে না বিধায় শিক্ষকের কিছুটা সুবিধা হয়।

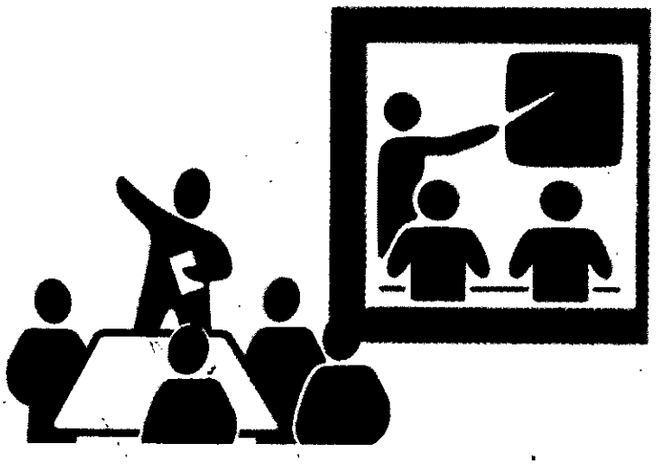

সরকারি স্কুলগুলোতে এক একটি ক্লাসে ৩০-৪০ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করে সকলকে পূর্ণাঙ্গভাবে শিখানো কতটা সম্ভব হয় তা সহজে অনুমেয়। কারণ সেখানে দ্রুত শিখার এবং ধীরে শিখার মতো দু'ধরনের/শিক্ষার্থী থাকে। এসব স্কুলে সকল শিক্ষার্থী কোনো রকমের ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই ভর্তি হতে পারে। যেমন, একই শিক্ষাদান পদ্ধতিতে একজন অঙ্কে ১০০-তে ৯৯ পায় আবার তারই আরেক সহপাঠী পায় মাত্র ২০-২৫।

সম্প্রতি কয়েকটি স্কুল ঘুরে দেখা গেল যে, প্রাথমিক সমাপনি পরীক্ষার জন্য যে-সব শিক্ষার্থী প্রস্তুতি নিচ্ছে গ্রামে তাদের ৮০%-এর পরিবারে পড়ানোর মতো কোনো ব্যক্তি নেই। আবার শহর এলাকায় দেখা যায় যে, ২০%-এর পরিবারে কোনো ব্যক্তি নেই যে, শিক্ষার্থীকে পাঠ শিক্ষার জন্য সাহায্য করতে পারে। সম্প্রতি রাজশাহী শহরে গিয়ে দেখি যে, বস্তিতে থাকা লোকেরাও শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরও ব্যাচে কোচিং করাচ্ছে। তারা ৩০০-৪০০ টাকা দিয়ে ১.৫-২ ঘণ্টার জন্য কোচিং করায়। মায়েদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল যে, তাদের কেউ কেউ পড়ানোর মতো ক্ষমতা থাকার পরও কোচিং-এ দিয়েছে কারণ মায়ের কাছে মনোযোগ দিয়ে পড়তে চায় না। আবার মা ঘরের কাজে মন দিলে বই-খাতা রেখে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে।

দেশে যেখানে সরকারি হিসাবে ৩০% লোকের কোনো অক্ষরজ্ঞান নেই, সেখানে তাদের সন্তানকে বাড়িতে পড়ানোর কোনো প্রশ্নই আসে না। আর যাদের অক্ষরজ্ঞান আছে তাদের সকলের ঐসব শিক্ষার্থীদের পড়ানোর মতো যোগ্যতা বা সময় নেই। তাহলে তারা কি করবে? তাদের এ চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষিত বেকারেরা কোচিং সেন্টার খুলে এই ঘাটতি কিছুটা পূরণ করার চেষ্টা করছে।

আবার শহরেও দেখা যায় যে, কর্মজীবী নারীরা নিজেরা সময় দিতে পারে না বলে সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে পারে না। আবার বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে সকলে অভ্যস্ত নয় বিধায় এমনকি শিক্ষিতদের পক্ষে সে শিক্ষা দেওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। তাই শহর এলাকায় কোচিং সেন্টারের চাহিদা আর্থিক এবং পেশাগত কারণে আরো বেশি। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে দুর্বল হওয়ার কারণে বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে কোনো না কোনোভাবে শ্রেণি শিক্ষকের বাইরে কারো না কারো সাহায্য নিতে হয়।

অনেক সম্প্রতি প্রাথমিক সমাপনি ও জুনিয়র স্কুল সমাপনি পরীক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলেন। তাঁদের যুক্তি হলো এতে অভিভাবকদের মধ্যে টেনশন বেড়েছে। কিন্তু দেখা যায় যে, শহর এবং গ্রাম উভয় ধরনের স্কুলের (সরকারি, বেসরকারি এবং এনজিও) শিক্ষার্থীরা বর্তমান পিএসসি এবং জেএসসি পরীক্ষাকে পছন্দ করেছে। তাদের যুক্তি হলোঃ পিএসসি হলে একটা সরকারি সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, এ জন্য বেশ ভালোভাবে পড়াশুনা হয়, বইগুলো অনেক ভালোভাবে পড়া হয়, শিক্ষকেরা অনেক বেশি পড়ান, উঁচু ক্লাসে গেলে বেশি বই পড়ার ভয় থাকে না ইত্যাদি। তারা পিএসসি পরীক্ষাকে ভয় পায় না কারণ এর আগে আরো ১০-১২টি পরীক্ষা দিয়ে থাকে। একইভাবে জেএসসি পরীক্ষাকেও তারা ভয় পায় না। কারণ এসব পরীক্ষায় খুব কমই ফেল করে। তাই এ দুটি পরীক্ষার চাহিদা শিক্ষার্থীদের কাছে রয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন কারণে আগের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতার প্রয়োজন হচ্ছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে আগের চেয়ে যোগ্যতার চাহিদা অনেক বেড়েছে। জাতীয়ভাবে আরো বেশি দক্ষতার চাহিদা রয়েছে। আর তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রশিক্ষণ এবং নিবিড় চর্চা অব্যাহত রাখা দরকার। সরকারকে সে দায়িত্ব বেশি করে পালন করতে হবে। তবে তার জন্য বেসরকারি খাতকে আরো দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে।

● **লেখক : চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট**